পথের টানে

রোডস-এর পথে

রাজর্ষি পাল

ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ রোডস। গ্রিসের অধীনে। তবে তুরস্কের একদমই কাছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী রোডস। প্রাচীন কালের দীর্ঘশ্বাস আর ফিসফিসানি রোডসের পথে-ঘাটে। ইতিহাসের টানে আমার রোডস যাত্রা, তার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের গভীরে স্কুবা ডাইভিং-এর হাতছানি।

ব্রিস্টল থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার ওপর বিমানযাত্রার পর রোডস-আইল্যান্ড পৌঁছলাম স্থানীয় সময় বেলা দেড়টা নাগাদ। আগে থেকে অ্যাপার্টমেন্ট বুক করে রেখেছিলাম, বাসরুটের একদম শেষ প্রান্তে, দ্বীপের একদম দক্ষিণে। জায়গার নাম পেফকস।

পথের বেশিটাই ভূমধ্যসাগরের সমান্তরালে। হোটেল এবং রিসর্টগুলোতে ট্যুরিস্টদের নামাতে নামাতে চলল বাস। ঘণ্টা দুয়েক পর পাহাড়, জঙ্গল আর ছোট ছোট জনবসতি পেরিয়ে পৌঁছলাম পেফকস। আমার জন্য অপেক্ষারত অ্যাপার্টমেন্টের মালকিন। বয়স্কা গ্রিক ভদ্রমহিলা। যত্ন করে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন গ্রিক অ্যাক্সেন্টে ভাঙা ইংরেজিতে। পৌঁছে মন ভরে গেল। চারপাশে খোলামেলা জায়গা আর বাগান। শান্তির জায়গা। পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। পেছনের ব্যালকনি থেকে দেখা যাচ্ছে ভূমধ্যসাগর, পাহাড় আর জঙ্গল। আমি ছাড়া আর কোনও ট্যুরিস্ট নেই। করোনার আবহ থেকে পর্যটন শিল্প ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে সবে। এখনও পর্যটকদের সমাগম শুরু হয়নি।

২৫ এপ্রিল ২০২২। আজ ডাইভিং শুরু হল। ভোর সাড়ে আটটায় লেপিয়া ডাইভ সেন্টারের গাড়ি এসে আমাকে তুলে নিল। ভূমধ্যসাগরের পাশ দিয়ে দিয়ে যেখানে পৌঁছলাম সেই জায়গার নাম প্লিমিরি। রোডস ইংল্যান্ডের একদম দক্ষিণ বিন্দু। এখানে হারবার-এ অপেক্ষারত ছোট স্পিড বোট। এদিক-ওদিকে দু-একটা মাছ ধরার বোট। আর কোনও মানুষজন নেই। ডাইভিং করব সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত এক জাহাজে। নাম জিয়ানুলা-কে, এক কার্গো শিপ। ১৯৮১ সালে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে তলিয়ে যায় সমুদ্রে। বর্তমানে সমুদ্রের তলদেশে একুশ মিটার গভীরে একদিকে কাত হয়ে শায়িত। দুবার ডাইভিং করে সম্পূর্ণ হবে জিয়ানুলা-কে অভিযান। প্রথম বারে আমরা নামব জাহাজের ডেকের ওপর, প্রদক্ষিণ করব মূলত জাহাজের চারপাশ। দ্বিতীয়বারে নেমে

প্রবেশ করব জাহাজের অভ্যন্তরে।

এই ধরনের ডাইভিংকে বলে রেক ডাইভিং (wreck diving)। Wreckage অর্থাৎ ধ্বংসাবশেষ। ডাইভিং-এর সুপার স্পেশালিটি। অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে কয়েক বছর আগে এই ধরনের ডাইভিং এর ট্রেনিং নিয়েছিলাম। প্রথম ডাইভিং-এর জন্য তৈরি হলাম। শরীর ঢাকা ড্রাই স্যুট দিয়ে। কোমরে ভারি ওয়েটবেল্ট, পিঠে বাতাসের সিলিন্ডার, মাথায় হুড, মুখে মাস্ক। স্পিডবোটে বসে পায়ে পরে নিলাম ফিনস দুটো। স্কুবা ডাইভিং-এর জন্য দুধরনের স্যুট ব্যবহার হয়। ওয়েট স্যুট (wet suit) এবং ড্রাই স্যুট (dry suit)। ওয়েট স্যুটের ব্যবহার নিরক্ষীয় বা নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্রে। স্যুটের ভেতরে জল ঢোকে। মূলত শরীরকে বাঁচায় জলজ বিষাক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের সংস্পর্শ থেকে। শীতল সমুদ্রে ওয়েট স্যুট ব্যবহার করা যায় না। অধিক শীতলতায় হাইপোথার্মিয়া হয়ে বিঘ্ন এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই শীতল সমুদ্রে ডাইভিং-এর জন্য প্রয়োজন ড্রাই স্যুট। এটি স্পেস স্যুটের মতন সারা শরীরকে এমনভাবে ঢেকে রাখে যে শরীরের বেশিরভাগ অংশ শীতল জলের সংস্পর্শে আসতে পারে না। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই ধরনের স্যুট। স্পেস স্যুটের টেকনোলজি দিয়ে তৈরি। এই স্যুট ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন আলাদা ট্রেনিং।

স্পিডবোটে

ব্রিটেনের শীতল সমুদ্রে ডাইভিং করার প্রয়োজনে ড্রাই স্যুট কিনে রেখেছিলাম। কিন্তু করোনার আবহে ব্যবহারের সুযোগ পাইনি। রোডস আইল্যান্ডে এল সেই সুযোগ। ভূমধ্যসাগরে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। কিন্তু সমুদ্রের গভীরে যথেষ্ট শীতল। সঙ্গে করে ড্রাই স্যুট নিয়ে আসায় সুবিধা হল। স্পিডবোট ধীরগতিতে হারবার ছেড়ে বেরিয়ে গতি বাড়াল। সমুদ্রে তুফান তুলে লাফাতে লাফাতে যেন উড়ে চলল। হারবার ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। কিছু দূরে ডলফিন দেখা দিল। স্পিডবোটের সামনে জলের ভেতর লাফাতে লাফাতে চলল। একটা জায়গায় স্পিডবোট থামতে ডলফিনগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডুবে-যাওয়া জাহাজ শুয়ে একুশ মিটার গভীরে। কিন্তু জাহাজের মাস্তুলের ডগা জলের কয়েক মিটার গভীর অবধি উঠে আছে। দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বয়া জলের ওপরে ভাসছে। দড়ির অন্য প্রান্ত বাঁধা মাস্তুলের ডগার সঙ্গে। এক এক করে পেছন ঘুরে জলে ডিগবাজি খেয়ে পড়তে লাগলাম। কয়েক ফুট তলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠতে লাগলাম বিসিডি-তে ভরা বাতাসের টানে। সাঁতার কেটে পৌছলাম বোটের সামনের দিকে। বোটের সামনে বাঁধা দড়ি ধরে ধরে পৌঁছলাম লাল রঙের বয়া অবধি। আমাদের কয়েক মিটার গভীরেই মাস্তুলের ডগা। সবাই মিলিত হলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে ইঙ্গিত করে বিসিডি থেকে বাতাস বের করে দিয়ে ডুবে যেতে লাগলাম। মাস্তুল বরাবর সবাই নামছি। জলের রং সবুজাভ, যেন ফিল্টারের ভেতর দিয়ে দেখছি। যত নামছি কানের পর্দায় জলের চাপ অনুভব করছি। আঙুল দিয়ে দুই নাক চেপে মুখের ভেতরে

বাতাসের চাপ দিলে কানের পর্দায় চাপ কমে যাচ্ছে। একে বলে ভালসালভা টেকনিক। নামতে নামতে ধীর গতিতে এসে নামলাম ছতলা আন্দাজ গভীরে ডুবে থাকা জাহাজের ডেকের ওপরে। অদ্ভুতুড়ে অনুভূতি। আবছায়া সবুজাভ অন্ধকার। নৈঃশব্দ্য। অন্য কোনও পৃথিবীতে যেন পদার্পণ করেছি।

সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে পরস্পর কথা বলে জাহাজের ডেকের কিছুটা ওপরে ভাসন্ত অবস্থায় ধীর গতিতে এগিয়ে চললাম পায়ে বাঁধা ফিনসের সঞ্চালনায়। ছোট ছোট জানালা, ভেতরে অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। অন্ধকারের মধ্যে আরও অন্ধকার। এইবারে শুধু প্রদক্ষিণ। সুপ্ত জাহাজের সঙ্গে পরিচিতি। মিনিট পঁয়তাল্লিশ জলের তলায় থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসা। পাঁচ মিটার গভীরে পৌঁছে তিন মিনিট ভেসে থাকা একই গভীরতায়। একে বলে সেফটি স্টপ। সমুদ্রের গভীরে জলের চাপ অত্যন্ত বেশি। সেফটি স্টপ-এ পৌঁছে শরীরকে কম চাপের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিতে হয়। নইলে জলের ওপরে উঠে এলে শারীরবৃত্তীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। একে বলে ডিকম্প্রেশন সিকনেস। এটি এড়ানোর জন্যই প্রতি পাঁচ মিটার গভীরে উঠে তিন মিনিট থাকতে হয়। যত গভীরে যাওয়া যায় তত বেশি সময় দিতে হয়।

স্পিডবোটে চেপে ফিরে এলাম ডাঙায়। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে ফের যাত্রা শুরু। দ্বিতীয়বারে নেমে প্রবেশ করলাম জাহাজের অভ্যন্তরে। ছমছমে অন্ধকারে এক্সপ্লোর করলাম জাহাজের চেম্বার, ইঞ্জিন-রুম এবং অন্যান্য অংশ। সরু প্রবেশপথ বেয়ে প্রবেশ, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের অভ্যন্তরে অন্বেষণ, ফটোগ্রাফি এবং পরিশেষে সরু অংশ বেয়ে বহির্গমন।

২৬ এপ্রিল ২০২২। সেন্ট পলস বে থেকে স্পিড বোটে যাত্রা শুরু হল। বোটে আমরা তিনজন। স্ট্যামাটিস, টনি আর আমি। স্ট্যামাটিস স্পিডবোটের স্কিপার অর্থাৎ ড্রাইভার। টনি আন্ডার-ওয়াটার গাইড। খাঁড়ি থেকে ধীর গতিতে বেরিয়ে গতি বাড়াল স্পিডবোট। ক্লিফের দেওয়াল বাঁ দিকে রেখে কয়েকশো মিটার দূর দিয়ে সমুদ্রে তুফান তুলে উড়ে চলল। পাহাড়ের অনেক ওপরে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন গ্রিক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, বর্তমানে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। দুর্গের ধ্বংসাবশেষের তলা দিয়ে বোট উড়ে চলল দ্বীপভূমির সমান্তরালে। ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে যেখানে এসে থামল সেইখানে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত গুহা এবং টানেলের নেটওয়ার্ক। এই গুহায় প্রবেশপথ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সতেরো মিটার গভীরে, আন্দাজ পাঁচ তলার সমান। সমুদ্রের গভীরে ক্লিফের দেওয়ালের গায়ে প্রাকৃতিক টানেলের মুখ। গায়ে ড্রাই স্যুট, মাথায় হুড, মুখে মাস্ক, পায়ে ফিনস, কোমরে ওয়েট বেল্ট, পিঠে সিলিন্ডার নিয়ে গলায় বাঁধা ক্যামেরা সামলে ডিগবাজি খেয়ে পড়লাম জলে। কিছুটা তলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠলাম বিসিডিতে ভরা বাতাসের টানে। টনিও নেমেছে। জলের ওপরে ভেসে ওঠার পর সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে ডুব। বিসিডি থেকে বাতাস বের করে দিয়ে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগলাম সাগরের গভীরে। খাড়া ক্লিফের গা বরাবর নেমে যাচ্ছি। বাঁ হাতের কবজিতে ডাইভ কম্পিউটারে দেখাচ্ছে জলের গভীরতা, ধীরে ধীরে বাড়ছে। সতেরো মিটার গভীরতায় গুহার মুখ, ভেতরে অন্ধকার। মুখব্যাদান করে সাগরের অতলে শায়িত যেন প্রাগৈতিহাসিক দানব।

আগে ঢুকল টনি। তার পেছনে আমি। কিছুটা ঢোকার পর সরু হয়ে গেল সুড়ঙ্গপথ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে পায়ের কিকের সঞ্চালনে ধীরে ধীরে এগোনো। যেন দানবের অন্ধকার জঠরে প্রবেশ। পেছন ঘুরে দেখার চেষ্টা করলাম। অনেকটা পেছনে আলোকিত প্রবেশপথ অনেক

সমুদ্রের তলায়

ছোট হয়ে গেছে। সরু পথ বেয়ে এগিয়ে চলা। নড়াচড়া করারও জায়গা নেই। শ্বাস-প্রশ্বাসে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ। সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে আটকে যাব। নির্দিষ্ট গভীরতায় ভেসে থেকে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলা এখন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং প্লবতার ওপর নির্ভরশীল। বেশ বুঝলাম সুড়ঙ্গপথের গভীরে ভেসে থেকে কখনও কিছুটা ওপরে উঠে গেলাম, কখনও বা নেমে গেলাম আরও গভীরে। মাথা ঝিমঝিম করছে। খোলা সমুদ্রে বিপদ ঘটলে ওপরে ভেসে ওঠা যায়। এখানে তা সম্ভব নয়। এই ধরনের কেভ এক্সপ্লোর করার জন্য নিতে হয়েছিল আলাদা ট্রেনিং।

সমুদ্রের গভীরে জলের তাপমাত্রার বিভিন্ন স্তর থাকে। ওপরের দিকে উষ্ণ তাপমাত্রার স্রোত। গভীরে শীতল জলের স্রোত। বিভিন্ন গভীরতায় ক্রমশ শীতল হতে থাকে জল। শীতল জলের ওপর ভাসমান উষ্ণতর জলের স্রোত। অনেকটা জলের ওপর তেল ভাসার মতন। তাপমাত্রার এই বিভাজনকে বলে থার্মোক্লাইন জোন। সুড়ঙ্গের পথে এগিয়ে চলার সময়ে হঠাৎ করেই শীতল অনুভূতি। বুঝলাম থার্মোক্লাইন জোনে প্রবেশ করেছি। ডাইভ কম্পিউটারের স্ক্রিনে দেখাচ্ছে ১৩.৮ মিটার গভীরতা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চারতলা গভীরতায় রয়েছি এখন ভূগর্ভের অভ্যন্তরে। থার্মোক্লাইন জোনে তাপমাত্রার পরিবর্তনে টর্চের আলো প্রতিসৃত হয়, ঘটে দৃষ্টিবিভ্রম। আরও দিশেহারা অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে কোন দিকে চলেছি ঠিক নেই। গভীর থেকে আরও গভীরে ক্রমশ নেমে যাচ্ছি। কোথাও বা বিভিন্ন দিকে আরও সুড়ঙ্গের মুখ। নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছি টনির টর্চের আলো।

অবশেষে বহির্গমনের মুখে পৌঁছলাম। ডাইভ কম্পিউটারে দেখাচ্ছে ত্রিশ মিটার। অবশেষে বহির্গমন। অন্ধকার ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এলাম আলোয়। আমরা সমুদ্রের গভীরে নয় তলা আন্দাজ গভীরতায়। অন্তত আধঘণ্টা কাটিয়েছি পাতালের অন্ধকারে সমুদ্রের অতলে। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে স্কুবা ডাইভিং এবং দৃষ্টিবিভ্রম মানসিক শক্তিকে একদম নিংড়ে নেয়। ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা। অবশেষে উঠে এলাম সমুদ্রের ওপরে, বায়ুমণ্ডলে। নীল আকাশ এবং বাতাসের অভ্যর্থনা। পেছনে খাড়া ক্লিফ। ফিরে এলাম স্পিড বোটের ওপরে। ধরাচুড়ো খুলে স্পিড বোটে উঠে আসা বিশাল পরিশ্রমের কাজ। ফিরে চলল স্পিডবোট।

২৭ এপ্রিল ২০২২। রাতের অন্ধকারে স্কুবা ডাইভিং-এর আলাদা রোমাঞ্চ। সমুদ্রের তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে টর্চের আলোয় এগিয়ে চলা, সুড়ঙ্গ বা ক্রিভাসে প্রবেশ, দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, ঘনায়মান অন্ধকারে বিপদের আশঙ্কায় পঞ্চেন্দ্রিয় চূড়ান্ত সজাগ—সে এক আলাদা অনুভূতি। বিকেল বেলায় জ্যাক গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে তুলে নিল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। মিনিট পনেরো ড্রাইভ করে পৌঁছলাম সেন্ট পলস বে। সাজসজ্জা করে যখন

তটরেখায় গিয়ে দাঁড়ালাম তখন সূর্য ডুবতে আরম্ভ করেছে। ঢেউ ভেঙে ক্রমশ গভীরের দিকে এগিয়ে চলা। জলের তলায় অদৃশ্য পাথরের উপস্থিতি এবং ঢেউয়ের ধাক্কায় টালমাটাল অবস্থা। বুক সমান গভীরে পৌঁছে এবার পায়ে পরে নেওয়া ফিনস। টাইট এবং ভারি পোশাকে এক অসম্ভব জিমনাস্টিক। এবারে সাঁতার কেটে এগিয়ে চলা আরও গভীরের দিকে। তটরেখা থেকে আন্দাজ একশো মিটার দূর অবধি পৌঁছলাম। উত্তাল তরঙ্গের ছন্দে ভাসছি। সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার ঘনায়মান। পরস্পরের সঙ্গে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে জ্যাক এবং আমি ডুব দিলাম সাগরের গহনে। সাগর এখানে ছয় মিটার বা দোতলার সমান গভীর। ডুবতে ডুবতে নেমে এলাম সাগরের তলদেশে। আমরা এখন তলদেশ থেকে আন্দাজ দুই ফুট ওপরে ভাসমান।

দ্বীপভূমি থেকে পাথরের এক প্রাকৃতিক প্রাচীর সমুদ্রের মধ্যে প্রসারিত। আমাদের যেতে হবে প্রাচীরের ওই পারে, খোলা সমুদ্রের মধ্যে। যাওয়ার রুট সমুদ্রের গভীরে প্রাচীরের তলদেশে সুড়ঙ্গপথ। আজ দিনের বেলায় এ-পথেই ডাইভিং করেছিলাম। এখন রাতের অন্ধকার। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

সাগরের তলদেশ দিয়ে পৌঁছলাম সুড়ঙ্গপথের মধ্যে। দশ মিটার আন্দাজ গভীরতা, তিন তলার সমান। জ্যাকের টর্চের আলো অনুসরণ করে প্রবেশ সুড়ঙ্গের ভেতরে। একসময়ে সুড়ঙ্গের শেষে ক্রিভাসে প্রবেশ, সাগরের গভীরে গলিপথ। দুপাশে পাথরের প্রাচীর উঠে গেছে অনেক ওপরে। এক ক্রিভাস থেকে বেরিয়ে গেছে আরও ক্রিভাস। কোথাও বা হঠাৎ বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে বোল্ডারের আড়ালে। হঠাৎ করেই হারিয়ে যাচ্ছে জ্যাকের টর্চের আলো। দৃষ্টিবিভ্রম। অন্ধকারে সাগরের অতলে জাগ্রত জীবন। টর্চের আলোয় কৌতূহলী মাছ, লায়ন ফিস, অক্টোপাস, আরও কত কী! ফ্ল্যাশের আলোয় চেষ্টা করছি ছবি তুলতে। একই গভীরতায় ভেসে থেকে দ্রুত সঞ্চরমাণ জীবকে টর্চ বা ফ্ল্যাশের আলোয় ধরে রেখে ফটো বা ভিডিও তোলা এক দুঃসাধ্য প্রয়াস, প্রয়োজন চূড়ান্ত মনঃসংযোগ। তাতেই এল বিপদ।

একটি লায়ন ফিস পাথরের ওপরে পাখনা বিস্তার করে ধীরে অগ্রসরমান। প্রকৃতির অসম্ভব সুন্দর সৃষ্টি, রং-বেরঙের নকশা আধো অন্ধকারে টর্চের আলোয় আরও অপূর্ব এবং রহস্যময়। ফ্ল্যাশের আলোয় ক্যামেরার স্ক্রিনে তাকে বন্দি করার চেষ্টা করছি। খেয়াল নেই কখন ক্রিভাসের বাঁকে হারিয়ে গেছে জ্যাকের টর্চের আলো। ছবি তুলে পেছন ঘুরে আমি হতবাক। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সাগরের অতলে আমি একা। অদ্ভুত মানসিক পরিস্থিতি। অসহায় বোধ করছি। বিসিডিতে ভুল বোতামে চাপ দিয়ে আটকে গেলাম পাথরের খাঁজে। মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি বিচার করলাম। পাথরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করলাম নিজেকে। গোটা শরীর এবং মাথা ঢাকা পুরু ডাইভিং স্যুট এবং হুড দিয়ে। নইলে মারাত্মক আঘাত লাগতে পারত। পাথরের খাঁজ থেকে মুক্ত করে ক্রিভাসের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত অংশে এগিয়ে টর্চের আলোর সিগন্যাল দিতে লাগলাম।

সুরাহা হল। লাইটের ফোকাস দেখে ক্রিভাসের খাঁজ বেয়ে ফিরে এল জ্যাক। ফের দুজনে এগিয়ে চললাম ক্রিভাস বরাবর। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আমরা বেরিয়ে এলাম উন্মুক্ত সমুদ্রে। প্রাকৃতিক প্রাচীরকে হাতের বাঁদিকে রেখে সাগরের তলদেশ ধরে এগোতে লাগলাম। এগিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম যেখানে প্রাকৃতিক প্রাচীরের শেষপ্রান্ত। এখানে সমুদ্র থেকে খাঁড়িতে প্রবেশপথ। বাঁদিকে গেলে খাঁড়ি, ডানদিকে গেলে মুক্ত সমুদ্র। টর্চের সিগন্যাল দিয়ে বাক্যালাপ করে জ্যাক আর আমি মৃদু সন্তরণে বাঁদিকে ঘুরে ঢুকলাম খাঁড়ির ভেতরে। জল এখন ঘোলাটে। প্রাকৃতিক প্রাচীরকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে

চললাম তটভূমির দিকে, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। ফিনসের প্রতিটি সঞ্চালনে ধীরে ধীরে গভীরতা কমছে। কিন্তু ঘোলাটে জলের জন্য বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না। একটা সময়ে আমরা ফিরে এলাম তটরেখার কাছে। ভেসে উঠলাম জলের ওপরে। শুরু থেকে শেষ অবধি সময় লাগল ঘণ্টাখানেক। তটরেখা থেকে আন্দাজ পঞ্চাশ মিটার দূরে আমরা, সাগরের স্রোতে ভাসছি। অভ্যর্থনা জানাল তারকাখচিত অন্ধকার আকাশ, মৃদুমন্দ বাতাস। সামনে সমুদ্রসৈকতে একাকী অন্ধকার বালুকাভূমি। পেছনে খাঁড়ির অন্য পাড়ে পাহাড়ের ওপরে অন্ধকারে নিশ্চুপ প্রাচীন গ্রিক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। বহুদূরে সৈকতভূমির অন্য প্রান্তে মৃদু সংগীতের মূর্ছনা আর ক্ষীণ আলোর রেখা, রাতের অন্ধকারে বিচ-পার্টি। পা থেকে ফিনস খুলে নিলাম। সাঁতার কেটে এগোলাম যতক্ষণ না পায়ের তলায় জমি পাই। সাগরের তলদেশে ভরশূন্য অবস্থায় থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ। নিজের এবং শরীরের যন্ত্রপাতি যেন দশগুণ বেশি ভারি। দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে টাল খেয়ে পড়ে যাওয়ার জোগাড়। টালমাটাল হয়ে শেষ অবধি বেলাভূমিতে ওঠা। বেশ খানিকটা দূরে বালিয়াড়ির প্রান্তে আমাদের গাড়ি। গাড়ি অবধি পৌঁছে দম নিয়ে এক এক করে খোলা যন্ত্রপাতি এবং পোশাক। অসম্ভব ক্লান্তি। অবশেষে গাড়িতে উঠে বসা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল জ্যাক।

২৮ এপ্রিল ২০২২। দ্বীপভূমির উত্তরপ্রান্তে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা প্রাচীন দুর্গশহর—আদি রোডস। বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালির অধীনতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের অধিকার, শেষ অবধি ফের গ্রিসের অন্তর্ভুক্তি। যদিও গ্রিসের অধীন, তথাপি তুরস্কের খুবই কাছে অবস্থান রোডস দ্বীপের। রোডসের অধিকার নিয়ে গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যে চলে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ভোরবেলায় এসে আমাকে গাড়িতে তুলে নিল ট্যুর কোম্পানির এজেন্ট, ভিটালি কারম্যান। আমার অ্যাপার্টমেন্ট দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে আর দুর্গশহর দ্বীপের উত্তর প্রান্তে। ভূমধ্যসাগরের সমান্তরালে পথ। ঘণ্টা দুয়েক লাগল। গাড়িতে যেতে যেতে অনেক গল্প হল ভিটালি-র সঙ্গে। আদত বাড়ি মলডোভা—সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ, বর্তমানে স্বাধীন দেশ। শেষ অবধি পৌঁছলাম রোডস। দুর্গনগরী। বাইরে আধুনিক ইউরোপিয়ান শহর। গাড়ি থামল ট্যুর কোম্পানির অফিসের বাইরে। এল আরও কয়েকজন ট্যুরিস্ট। ট্যুর গাইড স্টেফানিয়া। ছোটখাট চেহারার বয়স্ক ভদ্রমহিলা। গ্রিক অ্যাক্সেন্টে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলে গেলেন। স্কুল টিচার ছিলেন। এখন রিটায়ার্ড। নাতিদের নিয়ে ভরা সংসার।

ট্যুর কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে হারবারের দিকে চললাম। সমুদ্রের পাশ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। বেশ কিছুটা হেঁটে একটি চার্চ। একসময়ে ক্যাথলিক চার্চ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন রোডসের দখল নেয় ইটালি তখন এই চার্চ তৈরি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রোডস গ্রিসের অধীনে গেলে অর্থোডক্স চার্চে পরিবর্তন করা হয়। স্টেফানিয়ার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। অদ্ভুত সুন্দর। মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রণাম জানিয়ে মোমবাতি গেঁথে দিলেন একটি পেতলের পাত্রে রাখা বালির মধ্যে। দেখাদেখি আমিও তাই করলাম। চার্চে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এবার উলটো দিকে চললাম, দুর্গনগরীর দিকে। খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বিস্তার লাভ করে মিনোয়ান সভ্যতা (মহাভারতের যুগের সমসাময়িক)—খ্রিস্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগে পর্যন্ত। তারপর উত্থান হয় মাইসেনিয়ান সভ্যতার। মাইসেনিয়ানরা পত্তন করে মাইসেনি, টাইরিনস, আরগোস নামে দুর্গনগরী,

গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে। ব্রোঞ্জের তৈরি যুদ্ধাস্ত্র এবং বর্ম তৈরিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে এই সভ্যতা। ইলিয়াডে বর্ণিত বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধ মাইসেনিয়ান সভ্যতার সমসাময়িক ঘটনা।

রোডস দ্বীপের একদম উত্তর প্রান্তে অবস্থান দুর্গনগরীর। বর্তমানে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। মাটির তলায় ছয় হাজার বছর আগের জনবসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে। পবিত্রভূমি জেরুজালেমের দখল নিয়ে ইউরোপের খ্রিস্টান বাহিনীর সঙ্গে আরবের ইসলামিক বাহিনীর তিনশত বছরের যুদ্ধ পরিচিতি লাভ করেছিল ক্রুসেড নামে। এগারোশো থেকে চোদ্দোশো শতক অবধি ইসলামিক বাহিনী জেরুজালেমের দখল নেয়। ক্রুসেডে খ্রিস্টান বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাইটরা, যাঁরা একাধারে ক্যাথলিক সন্ন্যাসী আর রণনিপুণ যোদ্ধা।

রোডসের নগরী তৈরি হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। তার একটি অংশে সপ্তম শতকে বাইজেনটাইন সম্রাটরা তৈরি করেন দুর্গ। উত্তরে কনস্ট্যান্টিনোপল (অধুনা তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল) এবং দক্ষিণে আলেকজান্দ্রিয়ার (মিশরের বন্দর নগর) মধ্যে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের মাঝপথে ছিল রোডস। বাণিজ্যতরী থামত রসদ নেওয়ার জন্য। তেরোশো শতকে তার ধ্বংসাবশেষের ওপরে নাইটরা তৈরি করেন দুর্গশহর।

নাইটদের আগমনের পর রোডস ফের তার প্রাচীন গৌরব এবং বৈভব ফিরে পায়। ইসলামিক অটোমানদের আক্রমণ নাইটরা প্রতিহত করেন পরবর্তী দুশো বছর। শেষ অবধি অটোমান সম্রাট সুলেমানের সঙ্গে ১৫২২ সালে নাইটদের চুক্তিস্বাক্ষর হয়। চুক্তির শর্তানুসারে রোডস থেকে পশ্চাদপসরণ করে নাইটদের বাহিনী। পিছিয়ে গিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ মাল্টাতে ঘাঁটি গাড়েন নাইটরা। রোডসের দুর্গনগরীর পথে আজও ফিসফিসিয়ে কথা কয়ে যায় মধ্যযুগের ইতিহাস। সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের কাহিনি, রণোন্মাদনা, হাস্য-কলরব-ক্রন্দনের কাহিনি। সুপ্রাচীনকালে যেখানে ছিল গ্রিক সূর্যদেবতা হোলিওসের মন্দির, সেখানে পরবর্তী যুগে তৈরি হয় রোমান কলোসাস। সপ্তম শতকে তৈরি হয় বাইজেনটাইন প্রাসাদ। নাইটদের আসার পর তৈরি হয় প্রশাসনিক হেড কোয়ার্টার। ১৪৮১ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাসাদের একাংশ। পরে পুনর্নির্মাণ হয়। ১৫২২ সালে অটোমানরা দখল করে রোডস। প্রাসাদকে পরিণত করা হয় মিলিটারি কমান্ড পোস্টে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালি দখল করে রোডস। প্রাসাদকে পুনর্নির্মাণ করা হয় ইটালির সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েল (তৃতীয়)-এর রিসর্ট হিসাবে। ইটালির ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনিও সম্ভবত এখানে আসেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রোডস পুনর্দখল করে গ্রিস। প্রাসাদকে পরিণত করা হয় মিউজিয়ামে।

নাইটদের দুর্গ

খোয়া পাথরের তৈরি সরু প্রাচীন পথ। দুপাশে দোতলা প্রাসাদের সারি। এই পথ বেয়ে অশ্বারোহী বর্মাবৃত নাইট যোদ্ধাদের আনাগোনা হত মধ্যযুগে।

সময় এখানে থমকে আছে আটশো বছর আগে। যেন এখনই অশ্বারোহী নাইটদের দল ছুটে যাবে পথ বেয়ে। কান পাতলে যেন শোনা যায় কলরব, রণোন্মাদনা। পথের ধারে ধারে সাতটি মধ্যযুগীয় সরাইখানা। মূলত নাইটদের থাকা-খাওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। দুর্গনগরীর একটা অংশে প্রাচীন বাড়িঘরগুলি আজ রেস্টুরেন্ট এবং হ্যান্ডিক্রাফটের দোকান।

ক্লিওবুলাস ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের এক ঋষি। তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল রোডস দ্বীপে ভূমধ্যসাগরের পারে লিন্ডোস বলে এক জায়গায় পাহাড়ের ওপরে। পাহাড়ের ওপরে প্রাচীন গ্রিক দুর্গ এবং প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। খ্রিস্টের জন্মের আনুমানিক ছশো বছর বা তারও আগে প্রতিষ্ঠিত এই দুর্গ। বর্তমানে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। লিন্ডোস-এ আজও বসবাস করেন প্রাচীন গ্রিকদের বংশধরেরা। ওখানে পৌঁছলাম যখন, তখন সূর্য অস্তাচলের পথে। ধ্বংসাবশেষ একদমই জনশূন্য। উন্মুক্ত আকাশের তলায় সমুদ্রের ওপরে প্রাচীন যুগের অস্ফুট বাক্যালাপ। অরণ্যের মর্মরধ্বনি আর সাগরের উচ্ছ্বাস ফিসফিসিয়ে বলে যাচ্ছে আবছায়া ইতিহাসের অজানা কথা। লিন্ডোস-এ পাহাড় দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘেরা সমুদ্রের এক খাঁড়ি। নাম 'সেন্ট পলস বে'। কথিত, খ্রিস্টান সাধু সেন্ট পল পরিব্রাজনকালে এইখানে নেমেছিলেন।

রোডস আইল্যান্ড-এর উত্তরে ছোট দ্বীপ সিমি। রোডস থেকে জাহাজে করে যেতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। সিমি আইল্যান্ডের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। রোডস-এর মতন সিমিও বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী—গ্রিক, রোমান, বাইজেনটাইন, অটোমান। রোডসের মতন সিমি-তেও ছিল নাইটদের ঘাঁটি এবং দুর্গ। আর আছে প্যানরমাইটিস—প্রাচীন চার্চ। সিমির বর্তমান আকর্ষণ হারবার-এর চারপাশ এবং পাহাড়ের ধাপে ধাপে জ্যামিতিক ছন্দে সাজানো রং-বেরঙের বাড়িঘর, প্রাচীন গ্রিক স্টাইলে। প্রাচীন এবং আধুনিকতার মেলবন্ধন। সিমিতে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম জাহাজ। রোডসের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ। ফিশিং ইন্ডাস্ট্রি এবং ট্যুরিজম-এর ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি। সিমির বর্ণময় দ্বীপে ছুটি কাটাতে আসেন হাজারে হাজারে ট্যুরিস্ট। বেশিরভাগই রোডস

লিন্ডোস-এ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ

সিমি আইল্যান্ড

থেকে ডে-ট্রিপ করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে সিমিতে কয়েকদিন ধরে চলে ওপেন এয়ার ফেস্টিভ্যাল। গোটা ইউরোপ থেকে ট্যুরিস্টদের সমাগম ঘটে। সমুদ্রের পাড়ে চলে ঐতিহ্যশালী নাচগানের উৎসব, সিনেমা ও আর্ট-এর প্রদর্শনী। ভোরবেলায় ভিটালি এসে গাড়ি করে নিয়ে গেল রোডস-এর হারবারে। সেখান থেকে জাহাজে ঘণ্টা দেড়েকের যাত্রার পর সিমি। পাহাড়ের ওপরে প্যানরমাইটিস বা প্রাচীন অর্থডক্স চার্চ এবং ক্যাস্ট্রো—নাইটদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এর একটা অংশ মেরামত করে ছোট মিউজিয়াম। খাড়া পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠা খুবই কষ্টকর। আড়াইশো সিঁড়ি ভেঙে উঠে প্রাচীন জনপদের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা প্রাচীন রাস্তা। গোলকধাঁধার মতন রাস্তা ধরে ফিরতে গিয়ে ভুল করে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের অন্য দিকে। ভুল যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন বাজে তিনটে। হারবার থেকে আমাদের ফেরার জাহাজ বিকেল সাড়ে তিনটে। ওটাই একমাত্র জাহাজ। ফিরতে না পারলে রাতের মতন আটকে পড়ব। পরের জাহাজ পরদিন বিকেলে। এদিকে রোডস এয়ারপোর্ট থেকে আমার ফেরার প্লেন পরদিন দুপুরে। হারবার পাহাড়ের উলটোদিকে প্রাণপণে সরু পাহাড়ি রাস্তা ধরে ছুটছি। ঘর্মাক্ত। জাহাজ ধরার আশা ছেড়েই দিয়েছি। তখনই দেবদূতের আবির্ভাব ঘটল। পাহাড়ি পথে মোটর বাইকে করে যাচ্ছিলেন এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক। আমাকে ওইভাবে দৌড়তে দেখে বাইক থামিয়ে ভাঙা ইংরেজিতে কথা বললেন। জাহাজ ছেড়ে দেবে শুনে বাইকের পেছনে বসিয়ে ঘুরপথে বাইক ছোটালেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে হারবারে জাহাজের পাশে এসে নামিয়ে দিলেন আমাকে। অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানালাম। ওঁর সাহায্য না পেলে বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়তাম। নাইটদের আশীর্বাদেই যেন ফাঁড়া কাটল আমার।

১ মে। ফিরে আসা। ভোরবেলায় ট্যুরিস্ট বাস এসে আমাকে তুলে নিল। চারপাশে বাগান, পাখির কলকাকলি, দূরে ভূমধ্যসাগর এবং পাহাড়ের স্মৃতি নিয়ে ফিরে চললাম। ঘণ্টা দুয়েক যাত্রার পর রোডস এয়ারপোর্ট। ইমিগ্রেশন এবং সিকিউরিটি চেকের পর আকাশে উড়ল বিমান। সঙ্গে থাকল ইতিহাসের স্মৃতিমেদুর হাতছানি আর ভূমধ্যসাগরের স্মৃতি।